সহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ভূমিকা এবং জরুরী জ্ঞাতব্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

ইলমে ফিক্বহ এর উৎপত্তি (نشأة علم الفقه)

মহানাবী (ﷺ) এর যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র **(الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم)**

জেনে রাখুন! রাসূল (ﷺ) এর স্বর্ণযুগে ফিক্বহ শাস্ত্র রচিত হয় নি। বর্তমান যুগের ফক্বীহগণ যেমনটি তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন বিধানের রুকনসমূহ, শর্তসমূহ, আদাব বা শিষ্টাচারসমূহ প্রণয়ন ও দলীল দ্বারা একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করার যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, রাসূল (ﷺ) এর যুগে ধর্মীয় বিধান নিয়ে এরূপ আলোচনা হয় নি। বর্তমান যুগের ফক্বীহগণ তাদের কর্মের রূপরেখা তৈরি করেছেন এবং এ রূপরেখা গুলোর সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যে বিধানকে যতটুকু সীমাবদ্ধ রাখা দরকার ততটুকু সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এরূপ অনেক কার্যক্রম বর্তমান যুগের ফক্বীহদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। আর রাসূল (ﷺ) এর স্বর্ণযুগের রূপরেখাটা ছিল এরূপ যে, তিনি যখন ওযূ করেছেন তখন সাহাবাগণ তাঁর ওযূ করা দেখেছেন। ‘‘এটা ওযূর রুকন, ঐটা আদব’’ এরূপ কোন বর্ণনা ছাড়াই সাহাবাগণ তাঁর ওযূর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তারা মহানাবী (ﷺ) কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন এবং যে ভাবে তিনি সালাত আদায় করেছেন সে ভাবেই তারা সালাত আদায় করেছেন। মহানাবী (ﷺ) হাজ্জ পালনের সময় জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর মত করেই তারা হাজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। মহানাবী (ﷺ) এর অধিকাংশ সময়টা এভাবেই কেটেছে। তিনি তাঁর উম্মতকে এমন কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি যে, ওযূর ফরয ৬টি বা ৪টি। তিনি এমনটি কখনও ভাবেন নি যে, মানুষ ধারাবাহিকতা ছাড়া ওযূ করবে। ফলে এ ওযূকে সঠিক বা ভুল বলে রায় দেয়া হবে। (তবে আল্লাহ্ চাইলে তা ভিন্ন ব্যাপার)। মহানাবী (ﷺ) এ সংক্রান্ত বিষয়ে খুব কমই জিজ্ঞাসিত হতেন। জনগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তার কাছে ফাৎওয়া চাইলে তিনি সে বিষয়ে ফাৎওয়া দিতেন। কোন সংকট দেখলে তা নিরসন করতেন। তিনি মানুষকে ভাল কাজ করতে দেখলে তার প্রশংসা করতেন। আর গর্হিত কাজ করতে দেখলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন। সমাজে ঘটে যাওয়া কোন বিচার ফায়সালার ব্যাপারে তার কাছে যে ফাৎওয়া চাওয়া হত, তার সঠিক সমাধান দিতেন। কেউ অন্যায় করলে তার প্রতিবাদ করতেন। প্রত্যেক সাহাবী যথাসম্ভব (আল্লাহ্ যা তার জন্য সহজ করে দেন) তাঁর ইবাদাত, ফাৎওয়া ও কোন সমাধান অবলোকন করে তা মুখস্থ করে নিতেন এবং তা মনে রাখতেন। তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো অনুধাবন করতেন। ফলে তাদের নিকট সঞ্চিত নিদর্শনের মাধ্যমে কেউ তাকে জায়েয বলতেন, কেউ মুস্তাহাব বলতেন, কেউ আবার মানসূখ (রহিত) বলতেন। কোন দলীলের দিকে দৃষ্টিপাত না করে নিজের আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তির ভিত্তিতে তারা মহানাবী (ﷺ) এর কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট ছিলেন। এভাবেই রাসূল (ﷺ) এর সোনালী যুগ অতিবাহিত হয়েছে।

সাহাবাদের যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র **(عهد الصحابة رضي الله عنهم)**

এর পর সাহাবাগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী হয়ে যান। তাদের

মাঝে বিভিন্ন ঘটনার উদ্ভব ঘটে ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে তারা বিভিন্ন ফাৎওয়ার সম্মুখীন হন এবং তাদের মেধা ও সংরক্ষিত জ্ঞান অনুযায়ী এর সমাধান দেন। যদি এগুলো সম্ভব না হত তাহলে ইজতিহাদ করে ফাৎওয়া দিতেন। রাসূল (ﷺ) যে বিধানের যে হুকুম দিয়েছেন তার কারণ জানার চেষ্টা করতেন। যেখানেই পাওয়া যাক না কেন রাসূল (ﷺ) এর কোন বিধানের ব্যাপারে অবগত হলে তারা তা বাস্তবায়ন করতেন। কোন ইবাদাত রাসূল (ﷺ) এর পদ্ধতির আলোকে বাস্তবায়ন হওয়ার ক্ষেত্রে তারা কখনও কার্পণ্য বা আলস্য করতেন না।

সাহাবাদের মতভেদের কারণ ও এর চিত্র (أسباب اختلاف الصحابة وصوره)

রাসূল (ﷺ) এর সাহাবাদের মাঝে তৎকালীন সময়ে যে মতানৈক্য সংঘটিত হয়, তার কয়েকটি নমুনা নিমেণ আলোচিত হলো:

১। কোন সাহাবা কোন বিষয়ের ফায়সালা অথবা ফাৎওয়ার বিধান শুনতেন, যা অপরজন শুনেন নি। ফলে যিনি শুনেন নি তিনি ঐ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে ফাৎওয়া দিতেন। এটা কয়েকভাবে হতে পারে-

(ক) হয়ত তার ইজতিহাদটা হাদীস মোতাবেক হয়ে যেত। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- একদা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, যার স্বামী তার মহর নির্ধারণ না করেই মারা গেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে এ বিষয়ে ফায়সালা দিতে দেখি নি। ফলে তারা বিষয়টি নিয়ে একমাস যাবৎ মতভেদ করেন এবং এর সঠিক উত্তর জানার চেষ্টা করেন। পরিশেষে ইবনে মাসউদ তার ইজতিহাদের মাধ্যমে ফাৎওয়া দিয়ে বললেন, মহিলার বংশীয় নারীদের মহরের ন্যায় তার মহর নির্ধারিত হবে। এর কমও দিবে না, বেশিও দিবে না এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে ও সে স্বামীর মীরাস পাবে। তখন মা’কাল বিন ইয়াসার দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, ‘‘আপনার ফায়সালার ন্যায় রাসূল (ﷺ) জনৈকা মহিলার ফায়সালা দিয়েছিলেন’’। এটা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এতো আনন্দিত হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কখনও এতো আনন্দিত হন নি।

(খ) তাদের মাঝে মুনাজারাহ বা তর্ক বিতর্ক দেখা দিত। ফলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হাদীস প্রাধান্য পেত। এরপর তারা ইজতিহাদ ত্যাগ করে শ্রুত বিষয়ের দিকে ফিরে যেতেন। যেমন: আবূ হুরাইরা (রাঃ) এর প্রথম মতামত ছিল যে, ‘‘যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় সকাল করবে সে সিয়াম পালন করতে পারবে না’’। ফলে রাসূল (ﷺ) এর কিছু সংখ্যক স্ত্রী তাকে এর বিপরীত খবর দিলে, তিনি (আবূ হুরাইরা) স্বীয় অভিমত পরিত্যাগ করেন।

(গ) তাদের কাছে হাদীস পৌঁছেছে। কিন্তু তা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নয়। ফলে তারা ইজতিহাদ ত্যাগ করেননি। বরং হাদীস নিয়ে সমালোচনা করেছেন। এর উদাহরণ হলো: একদা ফাতিমা বিনতে কায়েস উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, তিনি তিন তালাক প্রাপ্তা হলে রাসূল (ﷺ) তার জন্য কোন ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান নির্ধারণ করে দেন নি। উমার (রাঃ) তার এ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ‘‘আমরা কোন মহিলার কথা শুনে আল্লাহ্র কিতাবকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না, সে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে’’। আর আয়িশা (রা.) তাকে বলেন, হে ফাতিমা! ‘‘কোন বাসস্থান ও ভরণ পোষণ নির্ধারণ করা হয় নি’’ তোমার এ কথাটির সত্যতার ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর।

(ঘ) মূলতঃ তাদের কাছে কোন হাদীসই পৌঁছে নি। এর উদাহরণ হলো: আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) নারীদেরকে

নির্দেশ দিতেন যে, তারা যখন (জানাবাতের) গোসল করবে তখন যেন তাদের চুলের বেনী খুলে দেয়। এই ফাৎওয়াটি আয়িশা (রা.) শুনার পর বলেন, কি আশ্চর্য লাগছে, ইবনে উমার (রাঃ) মহিলাদের চুলের বেনী খুলার নির্দেশ দিচ্ছেন, তাহলে (হাজ্জের সময়) নারীদের চুল মুণ্ডন করতে নির্দেশ দেন না কেন! অথচ আমি ও রাসূল (ﷺ) একই পাত্রে (জানাবাতের) গোসল করতাম (তখন বেনী খুলতাম না) এবং তিন বারের বেশি সময় পানি ঢালতাম না।

২। সাহাবাগণ রাসূল (ﷺ) কে কোন কাজ করতে দেখলে, সেটাকে কেউ সুন্নাত বলতেন, কেউ আবার জায়েয বলেন: এর উদাহরণ হলো:

সাহাবাগণ রাসূল (ﷺ) কে তওয়াফের ক্ষেত্রে রমল করতে (বীরের ন্যায় চলতে) দেখেছেন, ফলে জমহুর আলিম তওয়াফের ক্ষেত্রে রমল করাকে সুন্নাত মনে করেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, মূলত রাসূল (ﷺ) এটা করেছিলেন মুশরিকদের উক্তি ‘‘ইয়াসরিবের জ্বর মুসলমানদের দুর্বল করে দিয়েছে’’ এ ধারণার কারণে। এটা সুন্নাত নয়।

৩। ধারণার কারণে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: রাসূল (ﷺ) হাজ্জ করেছেন এবং মানুষেরা তাঁর হাজ্জ প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে তাদের কেউ মনে করেন যে, তিনি হাজ্জে তামাত্তু করেছেন। কেউ মনে করেন, তিনি হাজ্জে কিরান করেছেন। আবার কেউ মনে করেন যে, তিনি হাজ্জে ইফরাদ করেছেন।

৪। ভুল-ভ্রান্তির কারণে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) রজব মাসে উমরা করেছেন। হযরত আয়িশা (রা.) এ কথা শুনে বলেন: ‘‘ইবনে উমার (রাঃ) এটা ভুল করে বলেছেন’’।

৫। হাদীস সংরক্ষণের ত্রুটির কারণে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: ইবনে উমার (রাঃ) রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণনা করে বলেন: ‘‘মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবার ক্রন্দনের ফলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে’’। হযরত আয়িশা (রা.) এর সঠিক সমাধান দিয়ে বলেন, ইবনে উমার (রাঃ) একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধারণার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো: ‘‘একদা রাসূল (ﷺ) জনৈকা ইয়াহুদীর কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, এমতাবস্থায় তার পরিবারবর্গ তার জন্য ক্রন্দন করছিল। অতঃপর মহানাবী (ﷺ) বললেন, তারা তার জন্য ক্রন্দন করছে, অথচ তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে’’। এর ফলে ইবনে উমার ধারণা করেছিলেন যে, ক্রন্দন করাটাই কবরে শাস্তি হওয়ার কারণ এবং তিনি আরও ধারণা করেছিলেন যে, এ হুকুমটা সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

৬। বিধানের কারণের মধ্যে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: জানাযার জন্য দাঁড়ানো। কেউ বলেন, এটা মূলতঃ ফেরেশতাদের সম্মানের জন্য দাঁড়ানো হয়। ফলে মু’মিন ও কাফির সবাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কেউ বলেন, মৃত্যুর ভয়ের জন্য দাঁড়ানো হয়। ফলে এ ক্ষেত্রেও মু’মিন ও কাফির সবাই অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ বলেন, ‘‘একদা মহানাবী (ﷺ) এর পাশ দিয়ে এক ইয়াহুদীর জানাযা অতিক্রম করছিল তখন তিনি তার মাথার উপর দিয়ে লাশটি অতিক্রম করাকে অপছন্দনীয় মনে করে দাঁড়িয়ে গেলেন। এতে বুঝা গেল, বিধানটি কাফেরের জন্য খাস।

৭। বিতর্ককারীদের মাঝে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ: এর উদাহরণ হল: মহানাবী (ﷺ) ক্বিবলাকে সামনে রেখে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। ফলে এক দলের মতে, এ হুকুম হল সার্বজনীন হুকুম এবং এ বিধান

রহিত হয় নি। আর জাবের (রাঃ) রাসূল (ﷺ) কে তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ক্বিবলাকে সামনে রেখে পেশাব করতে দেখেছেন। ফলে তিনি মনে করেন, এর ফলে পূর্বের নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইবনে উমার (রাঃ) ক্বিবলাকে পেছনে রেখে রাসূল (ﷺ) কে হাজাত সম্পূর্ণ করতে দেখেছেন। ফলে এর দ্বারা তিনি পূর্বের সকল মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরূপ আরও মন্তব্য রয়েছে।

তাবেঈদের যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র **(الفقه في عهد التابعين)**

মোট কথা, মহানাবী (ﷺ) এর সাহাবাদের যুগে তাদের মতামতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। অতঃপর তাবেঈরা যথাসাধ্য তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করতেন। এর পর তারা মহানাবী (ﷺ) এর হাদীস ও সাহাবাদের মতামত থেকে যা শুনতেন তা মুখস্থ করে নিতেন ও মনে রাখতেন। তারা মতভেদগুলো যথাসাথ্য সমন্বয় করার চেষ্টা করতেন। একটি মতামতকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে কিছু মতামতকে বাতিল করে দিতেন, যদিও বড় সাহাবাদের পক্ষ থেকে কোন আসার (সাহাবীর বাণী) প্রমাণিত হোক না কেন। যেমনটি কোন কোন ক্ষেত্রে (পরিস্থিতির আলোকে) মহানাবী (ﷺ) এর মতের উল্টো করাটাও তাদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

ফলে প্রত্যেক তাবেঈ বিদ্বানের অনুকূলে একটি করে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলে বিভিন্ন ইমামের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন: মদ্বীনায় সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও সালিম বিন আবদুল্লাহ বিন উমার। এদের পরে সেখানে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যুহরী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও রবীয়াহ বিন আব্দুর রহমান। মক্কাতে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, আত্বা বিন আবি রিবাহ। কুফায় ছিলেন ইবরাহীম আন-নাখঈ ও শা’বী। বসরাতে ছিলেন হাসান বসরী। ইয়ামানে ত্বউস বিন কায়সান এবং সিরিয়ায় ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মাকহুল । মহান আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরকে ইলম দ্বারা সিক্ত করেছেন এবং তাতে তারা মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাবেঈগণ তাদের কাছ থেকে হাদীস, সাহাবাদের ফাৎওয়া ও তাদের মতামত এবং এ সমস্ত বিদ্বানের মাযহাব ও তাদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছেন। যাদের ফাৎওয়ার প্রয়োজন হয়েছে তারা তাদের কাছে ফাৎওয়া চেয়েছেন। তাদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েলের উদ্ভব ঘটেছে এবং নেহা প্রকার বিচার-ফায়সালা তাদের নিকট উথাপিত হয়েছে।

সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও ইবরাহীম আন-নাখঈ এবং তাদের মতো আরও অনেকেই ফিক্বহ শাস্ত্রের অধ্যায় রচনা করেছেন। সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও তার অনুসারীগণ মনে করতেন যে, হারামাইনের অধিবাসীগণ ফিক্বহ শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি ছিল উমার (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) এর ফাৎওয়া এবং তাদের বিচার ফায়সালা। ইবনে উমার (রাঃ), আয়িশা ও ইবনে আব্বাসসহ মদ্বীনার কাজীদের বিচার ফায়সালাও তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল।

অপর দিকে নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও তাঁর অনুসারীগণ মনে করতেন যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) ও তার অনুসারীগণই ফিক্বহ শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি ছিল ইবনে মাসউদের (রা.) ফাৎওয়া। আলী (রাঃ) এর বিচার ফয়সালা ও তার ফাৎওয়া। শুরাইহসহ কুফার অন্যান্য কাজীদের বিচার ফায়সালাও তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। প্রত্যেক দলই বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা ও দলীল অন্বেষণের বিষয় খেয়াল রাখতেন। যে বিষয়ে বিদ্বানগণ ঐকমত্য পোষণ করতেন, সে টিকে তারা দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করতেন। আর কোন বিষয়ে যদি বিদ্বানদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিত তাহলে, শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ অভিমতটিই

তারা গ্রহণ করতেন। তাদের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা যদি কোন মাসআলার সমাধান দিতে না পারতেন, তাহলে তারা তাদের কথা ত্যাগ করে বিভিন্ন ইঙ্গিত ও মাসআলার দাবীটির অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। ফলে প্রত্যেক বিষয়ে তাদের নিকট অসংখ্য মাসআলার উদ্ভব ঘটে।

তাবেঈদের পরবর্তী যুগে ফিক্বহ শাস্ত্র (**الفقه بعد عهد التابعين**)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাবেঈদের পরবর্তী যুগে ইলম বহনকারী একটি দলের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। তারা তাবেঈদের কাছ থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাদের শাইখদের রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। তারা রাসূল (ﷺ) এর হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন। সাহাবী ও তাবেঈদের মতামত দ্বারা দলীল স্থাপন করেছেন। মূলতঃ তারা এটা জানতেন যে, তাদের (সাহাবী ও তাবেঈদের) কাছ থেকে যে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা হয় তা হয়তো, রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকেই গৃহীত যা তারা সংরক্ষিত করে 'মাওকূফ' হাদীসে পরিণত করেছেন। অথবা তারা যে মাসআলাটি ইসিত্মমবাত (উদ্ভাবন) করেছেন তা মানসূস বা শারঈ দলীল থেকেই গৃহীত। আর তারা যে ইজতিহাদটি করেছেন তা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই করেছেন। বাস্তবেই তারা (সাহাবা ও তাবেঈগণ) ছিলেন প্রত্যেক বিষয়ে তাদের পরবর্তী ধারক বাহকদের চেয়ে উত্তম কর্মী, অত্যধিক বিশুদ্ধ মতামত প্রদানকারী, যামানার দিক থেকে সবার অগ্রগামী এবং জ্ঞান সংরক্ষণে অত্যধিক তৎপর। তাদের (সাহাবা ও তাবেঈগণের) মধ্যে যে মতভেদগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে সে গুলো ছাড়া তাদেরই রেখে যাওয়া পথ ও পদ্ধতি দ্বারাই দ্বীনের আমল নির্দিষ্ট হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, (কোন পরিস্থিতির কারণে) রাসূল (ﷺ) এর হাদীস তাদের মতের প্রকাশ্য বিরোধী হয়েছে।

গ্রন্থ রচনার এই যুগে তাদেরকে ঐশী অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়েছিল। ফলে ইমাম মালিক ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবূ জি'ব মদ্বীনায়, ইবনে জুরাইয ও ইবনে উয়াইনা মক্কায়, সাওরী কুফায় এবং রবীঈ বিন সবীহ বসরায় কিতাব রচনা করেন। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) মদ্বীনাবাসীদের মধ্যে হাদীস বর্ণনায় বেশি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। সনদের দিক থেকে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তৎকালীন সাতজন ফক্বীহর চেয়ে তিনিই হযরত উমারের ফায়সালা, আবদুল্লাহ বিন উমার ও আয়িশা (রা.) এবং তাদের অনুসারীদের মতামতের ব্যাপারে অধিক অবগত। তিনি এবং তার মতো অনেকের মাধ্যমেই রেওয়ায়াত ও ফাৎওয়ার জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার কাছে যখন কোন বিষয়ের সমাধান চাওয়া হত, তখন তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন ও ফাৎওয়া দিতেন, ফলে সকলে উপকৃত হতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) দৃঢ়ভাবে ইবরাহীম আন-নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও তার অনুসারীদের মাযহাবকে গ্রহণ করেছিলেন। তার মাযহাব থেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হতেন না (তবে আল্লাহ্ চাইলে কিছুটা ব্যতিক্রম হত)। তার মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে তিনি সূক্ষ্ম নজর রাখতেন। মাসআলার শাখা-প্রশাখা রচনা করতেন। ফিক্বহশাস্ত্র সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অপরিসীম। এখানে তার (আবূ হানীফার) প্রসিদ্ধ অনুসারী আবূ ইউসূফ (রাহিমাহুল্লাহ) এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সময় মুহাম্মাদ বিন হাসান সমসাময়িক বিদ্বানদের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়নে সুদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন এবং অধ্যয়নে মনোনিবেশের ক্ষেত্রে অত্যন্তআন্তরিক ছিলেন। তার (মুহাম্মাদ বিন হাসান) ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবূ ইউসূফ (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট ফিক্বহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। অতঃপর মদ্বীনায় গিয়ে ইমাম মালিক রচিত 'মুয়াত্তা' অধ্যয়ন করেন। এর পর নিজ দেশে ফিরে যান। অতঃপর 'মুয়াত্তা' এর

যেসব মাসআলা তার অনুসারীদের মাযহাবের সাথে মিলে যেত, সেগুলো আলাদা করে এক এক করে সাজাতেন। আর যদি না মিলত তাহলে দেখতেন যে, যদি সাহাবা ও তাবেঈদের একটি দলের মতামত তার মাযহাবের অনুসারীদের সাথে মিলে যাচ্ছে, তাহলে তিনি সেটিকেই প্রাধান্য দিতেন। যদি তিনি কোন দুর্বল কিয়াস অথবা ব্যাখ্যা (তাখরীজ) পেতেন, যা এমন সহীহ হাদীস বিরোধী যে সহীহ হাদীসের উপর ফক্বীহগণ এবং অধিকাংশ বিদ্বান আমল করতেন, তাহলে তিনি তা (দুর্বল কিয়াস অথবা ব্যাখ্যা) ত্যাগ করে সালফে সালেহীনের বিশুদ্ধ অভিমতটিই গ্রহণ করতেন। তারা (মুহাম্মাদ বিন হাসান ও আবূ ইউসূফ) উভয়ে ইমাম আবূ হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) মতো যথাসাধ্য নাখঈ এর দলীলকেই গ্রহণ করতেন। এজন্য মৌলিকতার সামঞ্জস্য থাকায় তাদের এবং ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবকে একটিই মাযহাব মনে করা হত, যদিও মূল ও শাখাগত ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ছিলেন, যা ইমাম আবূ হানীফার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল।

তাদের মাযহাবের প্রকাশকাল এবং ফিক্বহী মূলনীতি ও শাখা প্রণয়নের সূচনা লগ্নে ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এর আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর তিনি তাদের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড- এমন কিছু বিষয় লক্ষ করেন, যা তাকে তাদের পথে চলতে বাধা দেয়। যেমন: তিনি তাদেরকে মুরসাল ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণ করতে দেখেন, যাতে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাদের লক্ষ করেছেন যে, বিতর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয় সাধনের উপযুক্ত কোন কায়দা বা নিয়ম-কানুন তাদের কাছে ছিল না। ফলে তাদের ইজতিহাদে অনেক ভুলভ্রান্তি স্থান পেয়েছে। এটা লক্ষ করেই তিনি কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করে গ্রন্থাকারে তা লিপিবদ্ধ করেন। ফিক্বহ শাস্ত্রের মূলনীতির বিষয়ে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত গ্রন্থ। ইমাম শাফেঈ তৎকালীন সময়ে আরও যে বিষয়গুলো লক্ষ করেছেন তা হলো, সাহাবাদের মতামতগুলো তার সময়ই একত্রিত হয়েছে এবং এগুলো ব্যাপকতা লাভ করে বিভিন্ন মতানৈক্য ও শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটেছে। তিনি দেখলেন যে এর অধিকাংশই এমন সহীহ হাদীস বিরোধী যেগুলো তাদের কাছে পৌঁছে নি। তিনি (শাফেঈ) সালফে সালেহীনদের দেখেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে তারা হাদীসের দিকেই ফিরে গেছেন। সুতরাং তিনিও তাদের বিতর্কিত অভিমতগুলোকে পরিত্যাগ করেন এবং বলেন: “তারাও মানুষ আমরাও মানুষ”।

ফক্বীহদের একটি দলকে তিনি দেখেছেন যে, তারা কিয়াস দ্বারা এমন কিছু রায়কে মিশ্রিত করেছেন, যা শরীয়াত অনুমোদন দেয় নি। ফলে এর একটিকে অন্যটি থেকে তারা পৃথক করেননি।

মোট কথা, তিনি (ইমাম শাফেঈ) যখন এ সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো লক্ষ করলেন, তখন ফিক্বহ শাস্ত্রের মূল মন্ত্রে মনোনিবেশ করে এর কিছু নীতিমালা ও শাখা-প্রশাখা প্রণয়ন করলেন এবং কিছু গ্রন্থ রচনা করলেন, যাতে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হতে পারে। তার এ কর্মপদ্ধতির উপর ফক্বীহগণ একাত্মতা ঘোষণা করলেন। অতঃপর তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ ভাবেই ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাযহাব বিস্তার লাভ করে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2195

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন